# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১৮ জুলাই ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা


## সংগঠিত, অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণির আহ্বান

# আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

শ্রমিকরা বন্‌ধ বা ধর্মঘট করলেই যাঁরা খড়্গহস্ত হন, শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিলেই যাঁরা হাততালি দেন, তাঁরা কিন্তু এ রাজ্যের শ্রমিকরা কী নিদারুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, সে বিষয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেন না। শোষণ বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হয়ে কখনও কোন শ্রমিকের হাত যদি মালিকের গায়ে পড়ে, তখন এঁরা 'গেল গেল রব' তোলেন, কিন্তু প্রতিদিন কলে-কারখানায়, চা-বাগানে, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কী ভয়ঙ্কর মালিকী শোষণ-অত্যাচারে শ্রমিকরা জর্জরিত হচ্ছে, অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, মনুষ্যেতর জীবনযাপন করছে, তার কোনও খোঁজ এঁরা রাখেন না, রাখলেও তাদের সমব্যথী হওয়ার, তাদের দুঃসহ জীবনের কথা লেখার কোনও তাগিদ এঁরা অনুভব করেন না।

শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা দেওয়ার নাম করে টাকা কেটে নিয়ে মালিকরা তা যেভাবে লুট করছে, সেজন্য কোনও শাস্তি তো দূরস্থান, জবাবদিহি পর্যন্ত তাদের করতে হয়না। কোনও সভ্য শাসনে এ জিনিস চলতে পারে? অথচ ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে তা চলছে, আর পশ্চিমবঙ্গ তো এ ব্যাপারে শীর্ষে! এ রাজ্যে কলে-কারখানায় শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া ৩২৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মালিকরা জমাই দেয়নি, আত্মসাৎ করেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যের চিত্র এমন ভয়াবহ নয়। শুধু ব্যক্তিমালিকরাই এই লুট চালাচ্ছে না, খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ও অধিগৃহীত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে এই বকেয়ার পরিমাণ ২৭ কোটি টাকা।

রাজ্যের চটকল শ্রমিকদের অবস্থা কী? ৮ জুলাই রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বলেছেন, "দুটি বাদে রাজ্যের অন্য কোনও চটকলের মালিক শ্রমিকদের পাওনা সংক্রান্ত চুক্তি মানেন নি।" মন্ত্রী আরও বলেছেন, " মালিকেরা অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করছেন।" ব্যস, এটুকুই। মালিকদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রী কী করেছেন? কোনও মালিককে শাস্তি দেওয়ার কথা ভেবেছেন ? আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার

*চারের পাতায় দেখুন*

**২৫ জুলাই**

**শ্রমিক-কর্মচারীদের**

## অবস্থান ও বিক্ষোভ

**রানি রাসমণি রোড, বেলা ১ - ৬টা**

# মেডিকেল ছাত্ররা আন্দোলনের পথে

*৮ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি ঘেরাও করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডি এস ও'র বিক্ষোভ*

সরকার ভেবেছিল, মেডিকেল শিক্ষায় 'ক্যাপিটেশন ফি' ছাত্রছাত্রীরা মেনে নেবে। অথবা প্রতিবাদ করলেও পুলিশি দমনপীড়নে তা স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীরা মেনে নেয়নি; তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র নেতৃত্বে গত ৮ জুলাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ক্ষোভের কারণ শুধু ফি বৃদ্ধিই নয়। রাজ্যে মেডিকেল কলেজগুলিতে যেভাবে বেসরকারি সংস্থাকে মুনাফা লোটার জন্য ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তা ছাত্রছাত্রীরা মেনে নিতে পারছে না। ৮ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মেডিকেল কলেজে এসেছিলেন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এম আর আই মেশিন উদ্বোধন করতে। তাঁকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীরা যখন ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি জানাতে থাকে তখন

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

**উন্নয়নের রথ চলছে**

# পানীয় জল পেতেও কর দিতে হবে

সি পি এম নেতারা বলেন তাঁরা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের উদারনীতি তথা বেসরকারীকরণের নীতির বিরুদ্ধতা করছেন এবং সি পি এম ফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে বিকল্প নীতি নিয়ে চলছে। তাঁদের এই দাবি যে কতবড় মিথ্যাচার, তা শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মতই এবার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস পরিচালনাধীন পুরসভাই হোক্ বা সি পি এম ফ্রন্ট সরকারই হোক — 'জল কি ঈশ্বর দেবে? সুপেয় জল সরবরাহ করতে প্রচুর খরচ হয়, অতএব সে জল পেতে গেলে খরচ করতে হবে' — এই ধরনের যুক্তি তুলে বিভিন্ন পুরসভায় ইতিমধ্যেই জলকর বসানো হয়েছে। অর্থাৎ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যবসায়ীকরণ ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার এবার পানীয় জল সরবরাহের মতো

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

**বিদ্যুতের মাশুল, শিক্ষায় ফি ও হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি, জমির বাড়তি খাজনা ও সেস, বর্ধিত পরিবহণ ভাড়া প্রভৃতি প্রত্যাহার এবং শ্রমিক ছাঁটাই, লেঅফ-লকআউট বন্ধ করা, চটশিল্পের কালাচুক্তি বাতিল করা ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে**

## এস ইউ সি আই-এর ডাকে

**২১ আগস্ট ২৪ ঘন্টার**

# বাংলা বন্‌ধ

**সফল করুন**

**বিদ্যুতের মাশুল ও সিকিউরিটি চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা বিদ্যুতের আলো বর্জন করুন**

# মেদিনীপুরে কৃষক বিক্ষোভ

বর্ধিত সেস ও খাজনা প্রত্যাহার, যথাযথ বি পি এল তালিকা প্রকাশ, ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, সমস্ত গ্রামে বিদ্যুতায়ন, বিদ্যুতের মূল্যহ্রাস প্রভৃতি দাবিতে এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ফি ও চার্জবৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ১ জুলাই থেকে ৪ জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বি ডি ও অফিসগুলিতে এস ইউ সি আই ও কৃষক খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষক ও খেতমজুররা বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেয়, কোন কোন ব্লক অফিস ঘেরাও করে রাখে।

২ জুলাই বেলদা বি ডি ও অফিসে পাঁচ শতাধিক কৃষক ও খেতমজুরের এক সুসজ্জিত মিছিল বেলদা শহর পরিক্রমা করে বি ডি ও অফিসে গিয়ে বি ডি ও-কে স্মারকলিপি দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও কিছুক্ষণ ঘেরাও করে রাখে। এরপর মিছিলকারীরা মেদিনীপুর-দীঘা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভ অবরোধে নেতৃত্ব দেন জেলার বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেডস সূর্য প্রধান, ধীরেন ওঝা ও তুষার জানা। ৩ জুলাই তমলুক বি ডি ও অফিস, মাদপুর বি ডি ও অফিস, ভগবানপুর ২ ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৪ জুলাই তমলুক মাতঙ্গিনী ব্লক অফিসে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে বি ডি ও-কে স্মারকলিপি দিয়ে দীর্ঘ সময় অফিস

ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুলিশ এসে ঘেরাও ভেঙে দেয়। ঐদিন ময়না বি ডি ও অফিস ঘেরাও করে তিন শতাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দাবি করে, খেয়াঘাট থেকে বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত ভাঙাচোরা পিচরাস্তা সারানোর প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে। বি ডি ও এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা সারানোর প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেলার বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেডস্ নকুল জানা ও বিবেক রায়। ঐদিন ভগবানপুর ১নং ব্লক, কাঁথি ৩নং ব্লক ও নন্দকুমার ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

## বীরভূমে কৃষক বিক্ষোভ

সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতির ফলে কৃষক ও খেতমজুররা আজ গভীর সঙ্কটে। খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ নেই, যতটুকু কাজ পায় তার জন্য উপযুক্ত মজুরি পায় না, গরিব মানুষ চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। পাট্টাপ্রাপ্ত গরিবদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সরকারের হাতে থাকা বিপুল পরিমাণ খাস জমি গরিবদের মধ্যে সরকার বণ্টন করছে না। বর্গাদারদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, বর্গা রেকর্ডিং স্থগিত রাখা হয়েছে। বি পি এল তালিকায় বহু গরিবের নাম নথিভুক্ত করা হয়নি। এইসব সমস্যগুলি সমাধানের দাবিতে বীরভূম জেলা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে ব্লক অফিসগুলিতে এবং আর আই অফিসগুলিতে ২৩ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে দাবিপত্রে শত শত কৃষক ও খেতমজুরদের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

# মেডিকেল ছাত্ররা আন্দোলনের পথে

*একের পাতার পর*

যথারীতি তাদের উপর পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। এরই প্রতিবাদে ৯ জুলাই ডি এস ও এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার যৌথভাবে মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্রদের কালো ব্যাজ পরিয়ে, মিছিল, মিটিং বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশের মধ্য দিয়ে ধিক্কার দিবস পালন করে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি এবং বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ডি এস ও আগামী ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাকশন ফোরামের আহবায়ক ডাঃ মৃদুল সরকার জানান, মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি সহ অন্যান্য খরচ বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁরা পৃথকভাবে সমস্ত মেডিকেল কলেজে ধর্মঘট ডাকবেন। স্টুডেন্টস্ অ্যাকশন ফোরাম ১৫ জুলাই মেডিকেল কলেজের সামনে অনশন অবস্থান করেছে।

ফি কী পরিমাণে বেড়েছে? এম বি বি এসে টিউশন ফি ছিল ১২ টাকা, এক লাফে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮৫০ টাকা। আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি পড়ার ক্ষেত্রে টিউশন ফি করা হয়েছে ৬৫০ টাকা। হোস্টেলের সিট রেন্ট মাসিক ১২ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫০০ টাকা, কশান মানি ২০০ টাকা থেকে হয়েছে ১০০০ টাকা। এছাড়া ১৫ শতাংশ সিট সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ধনীদের জন্য যেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়েই বিপুল পরিমাণে ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ভর্তি হওয়া যাবে। চার বছরে মোট ১০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিতে হবে। ক্যাপিটেশন ফি'র বিনিময়ে ভর্তি হতে পারা মানে শিক্ষায় মেধার কোনও ভূমিকা থাকবে না, অর্থই হবে শিক্ষা পাওয়ার মাপকাঠি। এই বিপুল পরিমাণ ফি বৃদ্ধির ষড়যন্ত্র আটকাতে না পারলে আগামী দিনে সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের মেডিকেল শিক্ষার সুযোগই থাকবে না। তাই ছাত্রছাত্রীরা আজ প্রতিবাদে সামিল হয়েছে।

এদিকে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি-বৃদ্ধিতে যতটা তৎপর, ভর্তি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ততোধিক নিষ্ক্রিয়। তাই দেখা যাচ্ছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি সমস্যা তীব্র রূপ নিলেও তাদের কোন হেলদোল নেই। কলেজগুলিতে উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে — যেখানে বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা বিভাগে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ভর্তি হত সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পঠনপাঠন তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিকল্প হিসাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা হয়নি। আবার যে স্কুলগুলিকে উচ্চমাধ্যমিক খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না — স্কুল কর্তৃপক্ষকেই পার্টটাইম শিক্ষক নিয়োগ করতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হলেও ল্যাবরেটরির কোন ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও তা নামমাত্র। শিক্ষকও নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক। এই সমস্ত স্কুলে ভর্তি হওয়া মানে জেনেশুনে পড়াশোনার সর্বনাশ করা। ফলে ছাত্রছাত্রীরা, অভিভাবকেরা চরম দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ছুটছেন। পাশ করার আনন্দই তাদের ম্লান হয়ে গেছে। অথচ ভর্তি সমস্যা অজানা রোগের মত কোন আকস্মিক সমস্যা নয়। প্রতি বছরই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বহু আন্দোলন হচ্ছে, ডেপুটেশনও দেওয়া হচ্ছে। তবুও এই অনড়, স্থবির সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ভাঙছে না।

অন্যদিকে যারা উচ্চমাধ্যমিকে কোনমতে ভর্তি হতে পেরেছে, তারা ইংরাজি পাঠ্যবই পাচ্ছেনা। বাজারে বই নেই। আগামী বছর ইংরাজির সিলেবাস পাল্টানো হবে বলে প্রকাশকেরা বেশি বই ছাপেনি। সরকার ইংরাজি বই যে সংস্থাকে ছাপতে দিয়েছিল তারা পর্যাপ্ত সংখ্যক বই ছেপেছিল কিনা, না ছেপে থাকলে তৎপরতার সঙ্গে ছেপে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কোন কিছুতেই রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে পড়াশোনা করতে এসে যে উৎকণ্ঠা, নৈরাজ্য এবং দায়িত্বহীনতার কবলে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের চরম ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তার পরিণাম কী দাঁড়াবে? শিক্ষা মানে তো শুধু পরীক্ষায় পাশ নয়, এরই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে শৃঙ্খলাবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, চরিত্রগঠন ইত্যাদি। সরকারে, প্রশাসনের স্তরে স্তরে যাঁরা আসন অলঙ্কৃত করে বসে থেকে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছেন তাঁরা কি এদিকটা ভেবে দেখেছেন?

আসলে এসবই পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। পুঁজিবাদ যত সঙ্কটে নিমজ্জিত হচ্ছে, তত সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে। ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন-ক্যাপিটেশন ফি চালু, পড়াশুনার পরিবেশ পরীক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করা, পাঠ্যবই প্রকাশে চরম নৈরাজ্য সবই এই চক্রান্তের অঙ্গ। সরকার শিক্ষার আর কোন দায়িত্বই পালন করতে চাইছেনা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারই নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে, প্রতিটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশেই শিক্ষার দায়িত্ব বহন করতে সরকার অস্বীকার করছে। এর একটা কারণ যেমন শিক্ষা সঙ্কোচন, আর একটা কারণ হচ্ছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা শিল্পে বিনিয়োগের সঙ্কট দেখা দেওয়ায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবামূলক ক্ষেত্রগুলিতে পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা করতে চাইছে। সেজন্য তারা যেমন সরকারকে চাপ দিচ্ছে শিক্ষার বেসরকারীকরণের জন্য সরকারও শিক্ষা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে টাকা নেই অজুহাত তুলে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করে বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করছে। সাথে সাথে অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য দূর করার কোন কার্যকর প্রচেষ্টাই করছে না যাতে জনগণ বিরক্ত হয়ে বেসরকারীকরণকেই সমর্থন করে। ফলে পুঁজিপতিদের ব্যবসার স্বার্থে যেমন শিক্ষার বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে তেমনি নানা কায়দায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করা হচ্ছে যাতে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় পুঁজিবাদের বিপদ হিসাবে দাঁড়াতে না পারে। সেজন্য শিক্ষার অধিকার হরণের প্রতিবাদে এবং 'সকলের জন্য শিক্ষা চাই' এই দাবিতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই প্রতিবাদে নামতে হবে। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাকে কোন কিছুর বিনিময়েই ভাঙতে দেওয়া যায়না।

### ডি এস ও'র কর্মীকে সি পি এমের হুমকি

# 'আন্দোলন করলে আই এস আই-এর চর বানিয়ে দেব'

নদীয়া জেলার ধানতলা থানার দত্তফুলিয়া হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ডোনেশনসহ ছাত্রপিছু ২৮৫ টাকা ধার্য করেন, যা এমনকি সরকার নির্ধারিত হারের চেয়েও অনেক বেশি। এই ব্যাপক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দেয়। আন্দোলনের ফলে ৪ জুলাই থেকে ভর্তি বন্ধ রাখা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র প্রতি ৫০ টাকা ডোনেশন কম করতে রাজি হন। কিন্তু ছাত্ররা জানায় ১৫০ টাকার বেশি ফি দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। এই দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন চালিয়ে যায়। সি পি এম আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা চালায়, ছাত্রদের সাথে বিরোধ হয়। ঘটনার মীমাংসার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ডি এস ও সংগঠকদের আলোচনায় ডাকেন। আলোচনার শেষে ফিরে আসার সময় বহিরাগত সি পি এম ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী হামলা চালায়, ডি এস ও সংগঠক কমরেড জামির শেখ গুরুতর আহত হয়, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে ৯ জুলাই নদীয়া জেলা ছাত্র প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। প্রতিবাদ দিবসের পোস্টারে কমরেড জামির শেখের নাম থাকায় সি পি এম বাহিনী ঐ পোস্টার ছিঁড়ে দেয় এবং ডি এস ও'র মুসলিম কর্মীদের হুমকি দিয়ে বলে "আন্দোলন করলে আই এস আই-এর চর বানিয়ে দেব।" এই হুমকি বুঝিয়ে দেয় আন্দোলনবিরোধী ভূমিকা নিয়ে সি পি এম দল আজ কোথায় নেমেছে। কিন্তু স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরা ছাত্রদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। হুমকি ও হামলা সত্ত্বেও ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ডি এস ও জেলা সম্পাদক অঞ্জন মুখার্জী আহবান জানিয়েছেন। আন্দোলন চলছে।

# কর্মচারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জয়ললিতা সরকার এমন হিংস্র ও ভয়ঙ্কর আক্রমণ করতে পারল কী করে

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, আইনকানুনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে তামিলনাড়ুর জয়ললিতা সরকার এক ধাক্কায় যেভাবে ২ লক্ষের ওপর ধর্মঘটি সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছে, আক্রমণের ভয়াবহতায় তা নজিরবিহীন। এই ঘটনা শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাকেই বিরাট প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাইরের গণতান্ত্রিক শাসনের ধাঁচাটি যে কত ঠুনকো, এই গণতন্ত্রে সরকার ও প্রশাসনের হাতে কী বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা আছে — তামিলনাড়ুর ঘটনা তা আবারও আমাদের দেখিয়ে দিল। এও বুঝিয়ে দিল এতবড় আঘাতের বিরুদ্ধে অবিলম্বে দেশজোড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং তার চাপে এখনই জয়ললিতা সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করা কতখানি জরুরি।

সকলেই জানেন, মালিকশ্রেণী, তাদের স্বার্থরক্ষক ডান-বাম সমস্ত দল এবং সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র দীর্ঘদিন ধরে "পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি", "উন্নয়ন" প্রভৃতির দোহাই দিয়ে ধর্মঘট, বন্ধ, শ্রমিক-আন্দোলন ও সাধারণভাবে যেকোন গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশজোড়া তীব্র প্রচার চালিয়ে আন্দোলন সম্পর্কেই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশব্যাপী আন্দোলনবিরোধী এই পরিকল্পিত প্রচারের সাথে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তামিলনাড়ুর জয়ললিতা সরকার আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারি দমননীতির এহেন নির্লজ্জ এবং ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারীরা আচমকা একটা কর্মসূচি নিয়ে প্রশাসনকে অচল করে দিয়েছেন এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষকে গুরুতর অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন — এমন নয়। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। রাজ্য সরকার আইনকানুন বদলে, ফতোয়া দিয়ে পেনশান, ভ্রমণভাতা, উৎসব ভাতা, ছুটি বিক্রি সহ সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য নানা সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করার বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন, সভা-সমিতি, প্রতীকী ধর্মঘট সবই হয়েছিল। কিন্তু সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতি কর্ণপাত করেনি শুধু নয়, সেগুলিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গিয়েছে।

এভাবে জয়ললিতা সরকারই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ সরকারী কর্মচারীরা বাধ্য হয়ে ২ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট শুরু করার সাথে সাথে সরকার প্রবল হিংস্রতায় আন্দোলন দমন করতে এতটুকু দেরি করেনি। তারা সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে 'এসমা' জারি করে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করে। তার ওপর দেশের মানুষের ব্যাপক বেকারত্ব ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একদল বেকারকে স্ট্রাইকব্রেকারে পরিণত করে ক্রীতদাসসুলভ শর্তে ঠিকায় নিয়োগ করতে শুরু করে। অর্থাৎ যে সরকারি কর্মচারীরা বছরের পর বছর কাজ করে আসছেন, তাঁদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব অস্বীকার করে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে জয়ললিতা সরকার দ্বিধা করেনি। দু'লক্ষেরও বেশি কর্মচারীর পরিবারের কয়েক লক্ষ সদস্যের কথাও সরকার চিন্তা করেনি। বরখাস্তের নোটিশ দেখে ইতিমধ্যেই একজন কর্মচারী হার্টঅ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। সর্বোপরি জয়ললিতা সরকার পুলিশ দিয়ে রাজ্য জুড়ে কর্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড ত্রাস সৃষ্টি করেছে। মাঝরাতে কর্মচারীদের বাড়ি বাড়ি পুলিশ হানা দিচ্ছে, এমনকি ধর্মঘটে যাঁরা যোগ দেননি তাঁদেরও নিশ্চিন্তে থাকতে দিচ্ছে না। এই সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কর্মচারীরা মাদ্রাজ হাইকোর্টে আবেদন জানালে বিচারক বরখাস্তের সরকারি আদেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন এবং ধৃত কর্মচারীদের মুক্তির আদেশ দেন। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে জয়ললিতা সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রায় কার্যকরী হতে দেয়নি। অবশেষে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ধৃত সরকারী কর্মচারীদের অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দিয়ে ছাঁটাই ধর্মঘটী কর্মীদের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে বলেন। এরপর শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন দল এক বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।

শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এত বড় আক্রমণ নামিয়ে আনা কেবল জয়ললিতা বা তামিলনাড়ু সরকারের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত — একথা ভাবার কোন কারণ নেই। জয়ললিতার বন্ধু কেন্দ্রে বিজেপি সরকারও জেনেবুঝেই সব চলতে দিয়েছে। কারণ এদেশে বহু কষ্টার্জিত শ্রমিক-কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একের পর এক কাড়তে কাড়তে আজও সামান্য যতটুকু প্রতিবাদ করার, আন্দোলন করার অধিকার অবশিষ্ট আছে, ক্রমবর্ধমান চরম সঙ্কটে আক্রান্ত পুঁজিপতিশ্রেণী সেটুকুও কেড়ে নিতে উদ্যত। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে যারাই যেখানে ক্ষমতাসীন তারাই আজ মিটিং-মিছিল, ধর্মঘট বন্ধ কী করে বন্ধ করা যায়, পুরো বন্ধ করতে না পারলে কী করে অন্তত কানুনী লাগাম পরিয়ে তাকে নির্বীর্য করা যায় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। কয়েক বছর আগে কেরালা হাইকোর্ট "জবরদস্তি" বন্ধ করা নিষিদ্ধ করে রায় পর্যন্ত দিয়েছে। রায়ে যা-ই বলা থাক ডান-বাম সব সরকার এবং সব প্রশাসনের চোখে সব বন্ধ-ই জবরদস্তি বন্ধ। তাই একটু চোখ মেলে বিচার করলেই দেখা যাবে, বিশেষ করে গত দশ-বারো বছর উদারীকরণ বেসরকারীকরণের সরকারী নীতি চালু হওয়ার পর "উন্নয়নে বাধা দেওয়া চলবে না" — এই অজুহাত তুলে সব ধরনের গণপ্রতিবাদের গলা টিপে ধরার একটা মরিয়া প্রচেষ্টা ক্ষমতাসীন সমস্ত দল বা জোটগুলিই করছে। তাদের এই চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই সত্তরের দশকের জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলির কথা মনে করায়।

স্বাধীনতার লড়াইকে পিষে মারার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্পদিন আগেই '৪৬ সালে দেশজোড়া শ্রমিক ও নৌসেনার আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করেছিল ব্রিটিশ শাসকেরা। স্বাধীনতার পর ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া সেই জুতোয় পা গলায় কংগ্রেস। দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকারে এবং রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে কংগ্রেস মালিকশ্রেণীর স্বার্থে একদিকে লাঠিগুলি চালিয়ে, অন্যদিকে ভারতরক্ষা আইন-পি ডি অ্যাক্টের মতো কালাকানুন জারি করে গণআন্দোলন দমন করেছে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে যারাই ক্ষমতায় এসেছে গণআন্দোলন দমনের এই নীতি তারা সকলেই অনুসরণ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই যেহেতু শোষণ-জুলুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এই ব্যবস্থার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থেকেই প্রতিবাদ-আন্দোলন ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ভোটের স্বার্থে দক্ষিণ বা বাম পরিষদীয় দলগুলিও শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের এই ক্ষোভকে কাজে লাগায়, প্রতিবাদ করে এবং লোকদেখানো আন্দোলন গড়ে তোলে — কিন্তু তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিক্ষোভকে-আন্দোলনকে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী ভয় পায় না। তারা জানে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত আন্দোলনকে ব্যালট বাক্সে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেবে, কোনমতেই চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যাবে না। পরিষদীয় রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত এই সমস্ত তথাকথিত বিক্ষোভ বা আন্দোলনও ততদিনই শাসক বুর্জোয়ারা চলতে দেয় যতদিন সেটাও তাদের পক্ষে বিপদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বিক্ষোভ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের সংগ্রামী চেতনা তীব্র হওয়ার, আপসহীন নেতৃত্বের পরিবর্তে সঠিক সংগ্রামী নেতৃত্ব চিনে নেওয়ার এবং সেই সঠিক নেতৃত্বে জনগণের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

এমনিতেই যেকোন আন্দোলন বা গণবিক্ষোভকেই বুর্জোয়ারা ভয় পায়। পরিষদীয় দলগুলির দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের পেছনেও নেতৃত্বের সংকীর্ণ স্বার্থ যাই থাক, বিক্ষোভ বা আন্দোলন সংগঠিত করার পিছনে যে মতলবই থাক্, জনগণ বা শ্রমিক-কর্মচারীদের কোন আন্দোলন বা বিক্ষোভই দীর্ঘস্থায়ী হোক্, বুর্জোয়ারা এটা কখনও চায়না। বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যবস্থা যখন মারাত্মক সঙ্কটের মুখে পড়ে, ইতিহাসের গুরুতর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায় তখন তার আন্দোলনভীতি প্রবল বেড়ে যায়। তাই সঙ্কটের সময় বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া সরকার আন্দোলন বিরোধী প্রচার আরও বাড়ায়, দমনমূলক আইনকানুন আরও কঠোর করে, আন্দোলনের উপর সরাসরি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তীব্রতর করে।

বস্তুত, স্বাধীনতার পর থেকে পুঁজিবাদকে সংহত করার পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করার সাথে সাথে আইনি পথে, গণতান্ত্রিক অধিকার মোতাবেক যতটুকু প্রতিবাদ আন্দোলন করার সুযোগ ছিল একে একে তার কণ্ঠরোধ করে কংগ্রেস ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করায় এবং একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হতে সাহায্য করে। সত্তরের দশকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেনা পাঠানো, সিকিমের ভারতভুক্তি, শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে নাক গলানোর মতো ঘটনার দ্বারা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি তার বিশ্বজনীন অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা জানান দেয়। এই সমস্তই সে করেছিল দেশের অভ্যন্তরে নির্মম পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদের গলা টিপে ধরে। সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার, দুঃখ কষ্ট বিনা প্রতিবাদে জনসাধারণকে মানতে বাধ্য করে অথবা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেকোন প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করে ভারতীয় পুঁজিবাদ আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এই পথেই ইন্দিরা গান্ধিও 'এশিয়ার মুক্তিসূর্যে' পরিণত হয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সময়েই টেক্সটাইল, জুটমিল, পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ, রেল প্রভৃতি থেকে লক্ষ লক্ষ কর্মচারীকে নির্মমভাবে ছাঁটাই করা হয়েছিল।

বর্তমান বিশ্বপুঁজিবাদী সংকটের যুগে ক্রমেই ভারতীয় পুঁজিবাদ গভীর থেকে গভীরতর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, জীবনজীবিকার অনিশ্চয়তা, ছাঁটাই, লকআউট লাগাতার চলছে। তার সাথে চলছে গণআন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরা, তা সে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, একমাত্র '৬৭ ও '৬৯ সালের পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের কথা আলাদা। ইন্দিরা গান্ধির আমলে ঘোষিত জরুরি অবস্থার অবসান হলেও দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি থেকেছে। নববইয়ের দশকে বিশ্বপুঁজিবাদের এই সঙ্কট বহুগুণ বেড়েছে এবং বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক তীব্র সঙ্কটের পাশাপাশি রাজনৈতিক সঙ্কটও আজ অত্যন্ত গভীর। কোটি কোটি টাকার খেলা, ক্রমবর্ধমান ব্যাপক কারচুপি, গুণ্ডাবাজি, জবরদস্তি বুথ দখল, পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষপাতপুষ্ট নগ্ন আচরণ প্রভৃতির ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রহসনটা সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলি, শাসকদল বা ক্ষমতাহারানো বিরোধী দল — রং যাই থাকুক, কারোর প্রতিই জনগণের পুরোপুরি আস্থা নেই। এসব দলগুলির মধ্যে কি আর্থিক নীতিতে, কি বৈদেশিক নীতিতে, কি শাসন পরিচালনা পদ্ধতিতে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। নির্বাচনেও কোন বিকল্প আর্থিক নীতির কথা বলে এরা ভোট চায় না। মুখে উন্নয়নের যত কথা বলুক, নির্বাচনে এদের ইস্যু হচ্ছে মূলত ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা বা অন্যকোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ। সেইসঙ্গে কেন্দ্রে ও রাজ্যে যখন যারাই ক্ষমতায় আসছে, তারাই একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ, উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করছে।

এই নীতি অনুযায়ী সরকারগুলির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মালিকশ্রেণীকে ক্রমাগত বেশি বেশি ভরতুকি ও কর ছাড় দেওয়া এবং আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়ে খাদ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষায় সরকারি খরচ কমানো। ফলে এগুলি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকদের প্রতি দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে পুরনো কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, আধুনিকীকরণের ফলে ছাঁটাই, ভি আর এসের ধাক্কায় মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

মুর্শিদাবাদ

## কৃষকদের বিক্ষোভ, অবরোধে লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

ক্ষেতমজুরদের পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ড প্রদান, বি পি এল তালিকায় প্রকৃত গরিবদের নাম রাখা, কৃষকদের বকেয়া খাজনা মকুব, বাসের ভাড়া কমানো, বিদ্যুতের অ্যাডিশনাল চার্জ ও বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে এবং নদীভাঙন রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবিতে এস ইউ সি আই এবং কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলন চলছে। অঞ্চল অফিস, আর আই অফিস ও বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়েছে ২৪ ও ২৫ জুন। ৩০ জুন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে এবং তারা অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

ইসলামপুরে হাজার হাজার মানুষ উপরোক্ত দাবিতে পথ অবরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পুলিশ অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে থানা পর্যন্ত দীর্ঘপথ নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করে। উত্তেজিত জনতা আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের হঠাতে গেলে জনতার সাথে তাদের ৪৫ মিনিট ধরে লড়াই চলে। অবশেষে জনতার সম্মিলিত প্রতিবাদে আটক আন্দোলনকারীদের পুলিশ মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

জঙ্গীপুরের রামপুরায় পথ অবরোধ করা হয়।

লালবাগে আস্তাবল মোড়ে, ভগবানগোলা ও অরঙ্গাবাদে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়।

## যুবমিছিল ও সভা

অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যুব সাধারণ সভা এবং বহরমপুরে যুব বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচি নেওয়া হয়। রানিনগর, বহরমপুর ও হরিহরপাড়ায় যুবসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী। সুতি, লালবাগ, ভগবানগোলা, ইসলামপুরে যুবসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু।

বেকারদের কাজ চাই, শিশুমৃত্যুর প্রতিকার চাই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহণের মূল্যবৃদ্ধি রোধ প্রভৃতি দাবি নিয়ে ৯ জুলাই একটি যুবমিছিল বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দান থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। অতিরিক্ত জেলা শাসকের হাতে স্মারকলিপি দিয়ে মিছিল গ্রান্ট হল ময়দানে ফিরে আসে। সেখানেই এরপর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার একদিকে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, অন্যদিকে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নতুন চাকরি দূরস্থান, ছাঁটাই চলছে ব্যাপক হারে। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই আক্রমণ হানছে। শিল্পহীন মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা-ভাঙনে বিধ্বস্ত যুবজীবনের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড মোসাববর হোসেন এবং যুবসংগঠক কমরেডস্ সামসুর আলম, ইনসার আলি ও কৌশিক চ্যাটার্জী।

## ২৫ জুলাই অবস্থান ও বিক্ষোভ সফল করুন

*একের পাতার পর*

উদ্যোগ নিয়েছেন? এ ব্যাপারে কিছুই তাঁরা করেন নি। মন্ত্রী একথা বললেন না যে, 'মালিকী অন্যায় বন্ধ করা হবে', কিন্তু বললেন, চটশিল্পে তিনটি শ্রমিক সংগঠন ১৮ আগস্ট থেকে লাগাতার ধর্মঘটের যে ডাক দিয়েছে তা ব্যর্থ হবে। মালিকী অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলন ব্যর্থ হোক — এটাই মন্ত্রী ও তাঁর দল সি পি এম ও শ্রমিক সংগঠন সিটু চায়। কারণ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ তিনটি শ্রমিক সংগঠনের এই আন্দোলন যেমন চটকল মালিকদের শোষণ-জুলুম-লুটের বিরুদ্ধে তেমনই যে রাজ্য সরকার ও সি পি এম শ্রমিক সংগঠন এই মালিকী অত্যাচারে সহায়তা করছে, তাদেরও বিরুদ্ধে।

শুধু চটশ্রমিক নয়, রাজ্যের সকল ক্ষেত্রের সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান নিয়ে এগিয়ে এসেছে তারা। ২৫ জুলাই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হতে আহবান জানিয়ে তারা বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতি ও বিশ্বায়নের মৌখিক বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির মতোই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে এ রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকার একই নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে শ্রমজীবী জনগণের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এই সরকার সরকারিক্ষেত্রে ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে এনে মালিকদের উৎসাহিত করেছে। ফলে সরকারি-বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রেই আক্রমণ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে ছোটবড় অসংখ্য কারখানা বন্ধ হওয়া, বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগগুলি জলের দরে বেচে দেওয়া, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করা, উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা, ভি আর এস দেওয়া, শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করা, শূন্যপদ তুলে দেওয়া, কুখ্যাত ঠিকা ও চুক্তিপ্রথা চালু করা, নামমাত্র বেতনে কাজ করানো, অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত না করা, কর্মরত সকলের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা না করা, মহার্ঘভাতা কার্যত ফ্রিজ করা, অসংগঠিত শ্রমিকদের সারা বছরের কাজ ও ন্যূনতম বেতনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া, শ্রমিক কর্মচারীর প্রাপ্য পি-এফ, গ্রাচুইটি ও ই-এস-আই'র কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা, আইন থাকা সত্ত্বেও লক-আউটকে বেআইনী ঘোষণা না করা, বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কষ্টার্জিত সমস্ত অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া, শিল্পে শান্তি(!) স্থাপনের ধুয়ো তুলে লাঠি-গুলি চালিয়ে, শ্রমিক হত্যা করে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা, স্পেশাল ইকনমিক জোন করে শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘট সহ সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করা — এসবই হল সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের কীর্তি। মুখ্যমন্ত্রীর বারবার সদম্ভ ঘোষণা — জঙ্গী আন্দোলন, ধর্মঘট বরদাস্ত করা হবে না। একদা বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান এ রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে লক-আউটে তাই প্রথম এবং শ্রমিক ধর্মঘট অনেক পিছনে। সরকারি হিসাবে পশ্চিমবাংলার নথিভুক্ত ৬৪ লক্ষ বেকারের, বেসরকারী মতে দেড় কোটি বেকারের দীর্ঘশ্বাস আর কাজ হারানো শ্রমিকদের সপরিবারে আত্মহত্যা, এই হল বামপন্থা আর মার্কসবাদকে কলুষিত করা সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ২৬ বছরের কুশাসনের নিট ফল। শুধু তাই নয়, কর-দরের বোঝায় সাধারণ মানুষ জর্জরিত। সকলের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার ভূলুণ্ঠিত। বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে সমস্ত পরিষেবাই আজ পণ্য। বিদ্যুতের দাম, জলের উপর কর, জমির খাজনা-সেস-মিউটেশন ফি-রেজিস্ট্রেশন ফি, পরিবহণের ভাড়া, স্কুল-কলেজের ফি, হাসপাতালের চার্জ সবই বাড়ছে। অথচ শ্রমিক-কর্মচারীদের জমানো প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার সুদ কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই রাজ্য সরকারও সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১% কমিয়ে দিয়েছে। ফলে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা আজ খুবই বিপন্ন। এ সরকার অজুহাত দিচ্ছে আর্থিক সঙ্কটের। অথচ মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস-ব্যসন, দুর্নীতি-অপচয়, স্বজন-পোষণে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে, আর দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা ছাড় দিতে টাকার অভাব ঘটছে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন করা যায়, এই সরকার কার স্বার্থ রক্ষা করছে — মালিকশ্রেণীর, না শ্রমিক কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের? বিচার করে দেখা যাক — (১) পি এফ, ই এস আই এবং গ্রাচুইটির কোটি কোটি টাকা মালিকরা ফাঁকি দিচ্ছে কি করে? একটি মালিককেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না কেন? কেনই বা সরকার তার নিজস্ব সংস্থার কর্মচারীদের পি-এফের টাকা বাকি রেখেছে? এতে কি মালিকরা উৎসাহিত হচ্ছে না? (২) শ্রমিক-কর্মচারীদের ফাঁকি দিয়ে বেআইনি লক-আউট কি করে চলছে? কেনই বা শিল্পমন্ত্রী লকআউট কারখানার জমিতে হাউসিং কমপ্লেক্স করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করার কথা বলছেন? (৩) রাজ্য সরকারের আইনত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বোনাস আইন সংশোধন করে কর্মরত সকলের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন? (৪) চা-বাগিচা, বিড়ি, ইটভাটা, দর্জি, কৃষি-শ্রমিক প্রভৃতি ৫৪টি নথিভুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত থাকা সত্ত্বেও কোনক্ষেত্রেই শ্রমিকরা এই মজুরি পাচ্ছে না। শ্রমিকদের এই মজুরি না দেওয়ার ফলে কার লাভ হচ্ছে? (৫) রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদের ১৫% ঘরভাড়া দেন। শিল্পমালিকদের ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিক যেখানে কাজ করে তাদের ৫% ঘরভাড়া দিতে হয়। রাজ্য সরকার আইন সংশোধন করে শিল্প শ্রমিকদের জন্য অন্তত ১৫% ঘরভাড়ার ব্যবস্থা করছেন না কেন? (৬) কেনই বা শ্রমমন্ত্রীর মদতে সিটু ও সহযোগী অন্যান্য কিছু ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাহায্যে চটশিল্পে 'কালাচুক্তি'র মাধ্যমে উৎপাদনভিত্তিক মজুরি মেনে নিয়ে শ্রমিকদের বেতন কাটার ব্যবস্থা করলেন? কার স্বার্থে ঐ চুক্তিতে একই কাজে দুরকম বেতন করে সমকাজে সমবেতনের নীতিকে অস্বীকার করলেন? (৭) মুখে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর বিরোধিতা করলেও এই সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ শিল্পে বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে এবং এর ফলে হাজার হাজার কর্মী উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছে। এই আইন পাশ হওয়ার পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে চুক্তি করে 'এস ই আর সি' (SERC) গঠন ও 'প্রফিট সেন্টার' গঠনের প্রক্রিয়া সরকার শুরু করেছে। আইন পাশ হওয়ার পরে তা দ্রুত কার্যকর করার জন্য 'সিটু' নেতাকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করেছে। এর ফলে কি বিদ্যুৎ কর্মচারী ও জনসাধারণ আক্রান্ত হচ্ছে না? (৮) লজ্জার কথা, হাজার হাজার কমিউনিটি হেল্‌থ গাইড্‌স ও ট্রেণ্ড দাই, যারা মাত্র মাসিক ১০০ টাকা বেতনে কাজ করেন, তাদের এক বছরের বেতন বাকি। এদের কিংবা অল্পবেতনে কর্মরত ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপার, অঙ্গনওয়াড়ী, হোমগার্ড প্রভৃতি অনিয়মিত কর্মীদের কেন উপযুক্ত বেতন দেওয়া ও নিয়মিত করা হচ্ছেনা? ২৬ বছরের এই শাসনে উপরোক্ত বিষয় সহ এরকম আরও বহু বিষয় আছে যা থেকে পরিষ্কার, সি পি এম ফ্রন্ট সরকার আসলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে চলেছে। ফলে শ্রমজীবী মানুষের উপর নেমে এসেছে এই আক্রমণ।

বন্ধুগণ, আক্রমণ বা আত্মসমর্পণ শেষ কথা নয়, প্রতিরোধও আছে। এই সরকারের জনবিরোধী ভাষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে টানা ১৯ বছরের লড়াইয়ে প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরে এসেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে-বিদ্যুতে-পরিবহনে চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অনেক রক্ত ঝরানোর ফলে কিছুটা হলেও তা কমেছে। চটশিল্পের শ্রমিকদের প্রতিরোধে কালাচুক্তি আজও চালু হতে পারেনি। লড়াই চলছে। আসুন — এই ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। এই লক্ষ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য সরকারের এই সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তা আরও ব্যাপক করতে এই রাজ্যে আগামী ২৫শে জুলাই ২০০৩ রাণী রাসমণি রোডে বিশাল গণঅবস্থান, বিক্ষোভ সমাবেশ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ঐ সমাবেশ থেকে জানানো হবে, যদি শ্রমজীবী মানুষের উপর এই আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাদের দাবি যদি না মেটে তাহলে শ্রমিকশ্রেণী আগামী দিনে ধর্মঘট, বন্ধ সহ আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে আবেদন, আপনারা ২৫শে জুলাইয়ের এই কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে যোগদান করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুন।

# দেশে দেশে আন্দোলন বিক্ষোভ

## জাপান

**বিমান বন্দরের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক ও যুদ্ধবিরোধীদের যুক্ত আন্দোলন**

জাপানের বিমান বন্দর নারিতার সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক ও যুদ্ধবিরোধীদের বিমান বন্দরের কাছেই একটি স্থানে ৩০ মার্চ এক বিশাল সমাবেশ হয়। "নারিতার সম্প্রসারণ বন্ধ কর" এই দাবিতে সানরিজুকা-শিবাইয়ামা ফার্মার্স লীগ অ্যালায়েন্স দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে। তাদের অন্য দাবিগুলি হচ্ছে, "মার্কিন সামরিক অভিযানে এই সামরিক বিমান বন্দরটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া বন্ধ কর", "ইরাকে যুদ্ধ বন্ধ কর" ইত্যাদি।

সমাবেশকারীদের বাধা দেওয়ার জন্য কাঁটাতার ও বিদ্যুতায়িত ১২ ফুট উঁচু ধাতু নির্মিত বেড়ার সামনে মোতায়েন রাখা হয়েছিল ১ হাজারের বেশি সেনা। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিবাদকারীদের মাথায় ছিল সাদা ও লাল রঙের শক্ত টুপি, হাতে ছিল অসংখ্য রক্ত পতাকা ও প্ল্যাকার্ড। এদের অনেকেরই শরীরে ছিল অতীতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষত চিহ্ন।

সমাবেশের পর একটা জঙ্গি মিছিল বিমান বন্দরের দিকে এগিয়ে যায়। মিছিলকারীরা স্লোগানের সাথে সাথে তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে এগোতে থাকে। তিনজন সংগঠককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ফার্মার্স লীগ দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে জঙ্গি আন্দোলন চালিয়ে আসছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও এসেছে। যেমন, তিনটি রানওয়ের মধ্যে দুটি রানওয়ে বানানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটি রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৮২৫০ ফুট থেকে কমিয়ে ৭২০০ ফুট করা হয়েছে। একটি রানওয়ের দুপাশে দুটি জমি থাকার দরুণ রানওয়ের কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা তাদের জমির অধিকার ছাড়েনি।

উড়ানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ফার্মার্স লীগ বিমান বন্দরের কাছে ১৯৭০ সালে ১৯৮ ফুট উঁচু এবং ১৯৮৮ সালে ১৩২ ফুট উঁচু দুটি ভারী ইস্পাতের টাওয়ার তৈরি করেছিল।

টাওয়ার দুটি ভাঙা নিয়ে জাপানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কৃষক ও তাদের সমর্থকদের বার কয়েক সংঘর্ষও হয়েছে। কাঁদানে গ্যাস মেশানো জলের একটা ট্যাঙ্ক সেনারা ট্রাকে চাপিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে এসে-ছিল, এখন সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় সেখানেই পড়ে আছে। প্রতিরোধে অংশ নেবার অপরাধে কয়েকজন সংগঠকের ১৬ বছর জেল হয়েছিল।

৩০ মার্চের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফার্মার্স লীগের সেক্রেটারি জেনারেল কোজি কিটাহারা বলেন, সামরিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন ও ইরাকের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন যুক্ত হয়ে গেছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলি নারিতা বিমান বন্দরকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে। আজ নারিতা বিমান বন্দর সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এ কারণে যেহেতু উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য মার্কিন সামরিক অভিযানে নারিতাকে ব্যবহারের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

অন্যদেশের যেসব সংগঠন ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে তাদের সঙ্গে সংহতি গড়ার ব্যাপারে কিটাহারা বিশেষ গুরুত্ব দেন। নিউইয়র্কের ANSWER সংগঠনের একজন প্রতিনিধি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানান।

জাপানের লোকোমোটিভ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ইয়াসাজিরো তামাকা বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, রেল শ্রমিক-দের তিনদিনব্যাপী ধর্মঘটের জেরে ৫০০ জন রেলশ্রমিক পিকেটিং করে ৬০০টি ট্রেনের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ২৬ জুন ২০০৩)

## ইকুয়েডর

**তেল শিল্পের বেসরকারীকরণ রুখতে লাগাতার ধর্মঘট**

৯ জুন থেকে ইকুয়েডরে ২২ হাজার তেল-শ্রমিক ধর্মঘটে নেমেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত। নিজেদের কোন আর্থিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য তেল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামেনি, তারা ধর্মঘটে নেমেছে তেল শিল্পের প্রস্তাবিত প্রাইভেটাইজেশানকে রুখে দিতে। মধ্য আমেরিকার এই গরিব দেশটিতে রাজস্বের অন্যতম বৃহৎ উৎস হচ্ছে সে দেশের তেল শিল্প এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তেল শিল্পের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৯ জুন ধর্মঘটে নেমেই তেল শ্রমিকরা পাইপলাইনে তেল সরবরাহ ১৮ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখে। এর ফলে তেল রপ্তানি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। তেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে সরকারি কর্মচারীরা ১৫ ও ১৬ জুন সংহতি ধর্মঘট পালন করেছে। (সূত্র ঃ দি ইকনমিস্ট (লণ্ডন) ২১ জুন ২০০৩)

*সরকারি আর্থিক নীতির প্রতিবাদে ফ্রান্সের মার্সেই শহরে রাজপথ অবরোধ*

## দক্ষিণ কোরিয়া

**লক্ষ কণ্ঠে দাবি উঠেছে "মার্কিন সেনা দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়ো"**

বিগত ৫০ বছর ধরে মার্কিন সেনা দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘাঁটি করে আছে। "মার্কিন সেনা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বেরিয়ে যাও" এই দাবি তুলে রাজধানী সিওল সহ সে দেশের ৬০টি শহরে দু'লক্ষেরও বেশি মানুষ মিছিল করেছে গত ১৩ জুন। উল্লেখ্য যে, গত বছর মার্কিন সেনাদের মহড়া চলার সময় সামরিক বাহিনীর একটি ভারি ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে দুটি দক্ষিণ কোরিয় বালিকা মারা যায়, ১৩ জুন ছিল তাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী।

সিম মি সন ও পিন হিয়ো সান নামে দুজন দক্ষিণ কোরিয় বালিকার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের রাগ আরও বাড়ে যখন গত নভেম্বর মাসে স্থানীয় একটি আদালত গাড়ি চাপা দেওয়ার ঘটনায় ধৃত মার্কিন সেনাবাহিনীর জনৈক সার্জেন্টকে বেকসুর খালাস করে দেয়। এ ঘটনার দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে চরম অপমান করা হয়েছে বলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ মনে করে।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে মার্কিন সেনাদের একটা বৃহৎ অংশ কোরিয়ায় আসে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে ৫০ হাজার মার্কিন সেনা সহ কয়েক লক্ষ কোরিয়াবাসী মারা যায়। তারপর থেকে মার্কিন সেনা কোরিয়ায় অবস্থান করছে। এখন সে দেশে মোট ৩৭ হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে।

যেসব কোরিয়াবাসী তাদের দেশে মার্কিন সেনার উপস্থিতির বিরোধিতা করেন না সেসব মানুষও কিন্তু স্ট্যাটাস অফ ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট সংক্ষেপে SOFA (কোরিয়ায় মার্কিন সেনার উপস্থিতি সংক্রান্ত দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি)কে সামনে রেখে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষের অন্যায় সুযোগ সুবিধা নেবার ঘটনায় অত্যন্ত রুষ্ট। SOFA তে বলা আছে যে, দক্ষিণ কোরিয়ায় অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আমেরিকার সেনাদের বিচার হবে মার্কিন দেশের আদালতে।

১৩ জুনের সমাবেশের উদ্যোক্তাদের মতে ঐদিনের বৃহৎ সমাবেশটি হয় রাজধানী সিওলে, সেখানে ৩০ হাজার মানুষ সমাবেশে যোগ দেয় এবং এদের অধিকাংশই হল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

মার্কিন দূতাবাসের নিকটবর্তী বাজার চকে সমাবেশ হয়। সমাবেশকারীদের অনেকেই জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে সমাবেশে এসেছে। সমাবেশ থেকে স্লোগান উঠেছে "খুনি মার্কিন সেনাদের বিচার চাই", "মার্কিন সেনা দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়ো।" হাজারখানেক বিক্ষোভকারী, তাদের বেশিরভাগটাই হলো ছাত্রছাত্রী, তারা মুখে কালো মুখোশ এঁটে ও প্লাস্টিকের তৈরি ডাণ্ডা হাতে নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের দিকে ধেয়ে যায়। অপর একদল বিক্ষোভকারী, তাদের সংখ্যাও কয়েক হাজার, তারা একটি মার্কিন পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে দেবার জন্য রায়ট পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর গ্যাস নিক্ষেপ করে।

আগের দিন (১২ জুন) রাতে ছাত্ররা দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটি ইয়ংসান গ্যারিসনের দেওয়ালের উপর চড়ে বসে মার্কিন সেনা সরানোর দাবি জানানোর পাশাপাশি মার্কিন সেনাদের অপরাধের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। দেশের অন্য শহরগুলিতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে মিছিল করা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভকে চাপা দিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল লিন জে লা পার্টে এক বিবৃতিতে ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মার্কিন সেনাদের দিয়ে একটা শোকসভারও আয়োজন করেন।

(সূত্র ঃ ওয়ার্কাস ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ২৬ জুন ২০০৩, ইণ্টারনেট থেকে পাওয়া)

# সরকার নিজেই পি-এফের টাকা দিচ্ছে না বলেই মালিকরা বেপরোয়া

পশ্চিমবঙ্গই ভারতের মধ্যে প্রথম যেখানে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা সবচেয়ে বেশি আত্মসাৎ করেছে। শ্রমিকদের ৩২৪ কোটি টাকা মালিক পক্ষ মেরে দিয়েছে। রাজ্যে একটি বামপন্থী সরকার থাকতে মালিকদের পক্ষে কীভাবে এটা সম্ভব হল? কারণ সরকার নিজেই তার অধিগৃহীত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে পি-এফের টাকা দিচ্ছে না। এই কারণে মালিকপক্ষও নির্ভয়ে শ্রমিকদের বঞ্চনা করে চলেছে। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিক-কর্মচারীস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে চলছে। তাই সহজেই "বন্ধ সংস্থার কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হলে বামফ্রন্ট সরকারের কিছু করার নেই বলে মন্তব্য করেন শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন।" (বর্তমান ২৭-৬-০৩)। ৮ জুলাই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, চটকলের মালিক শ্রমিকদের পাওনা সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানছেন না। (আনন্দবাজার ৯-৭-০৩)। স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে তাঁরা ক্ষমতায় আছেন কেন? শ্রমিকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য আদায়ের আন্দোলন করলে তা দমন করার জন্য? বাস্তবে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে বামফ্রন্ট সরকার কোন মালিকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টে শ্রমিকদের উপদেশের নামে হুমকি দিয়েছে তারা যাতে জঙ্গি আন্দোলনের পথে না যায়। ফলে মালিকরা এ রাজ্যে শ্রমিক শোষণের ছাড়পত্র পেয়েছে। রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের সঠিক নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে তবেই একমাত্র এই মালিকী বঞ্চনা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

### পি এফের টাকা আত্মসাৎ কোন্ রাজ্যে কত

| | |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ৩২৪ কোটি টাকা |
| মহারাষ্ট্র | ১৬৬ কোটি টাকা |
| তামিলনাড়ু | ৯০ কোটি টাকা |
| মধ্যপ্রদেশ | ৮৮ কোটি টাকা |
| উত্তর প্রদেশ | ৮৫ কোটি টাকা |
| অন্ধ্র প্রদেশ | ৭৮ কোটি টাকা |
| কর্ণাটক | ৫৮ কোটি টাকা |
| কেরালা | ৫৬ কোটি টাকা |
| ওড়িশা | ৪৮ কোটি টাকা |

(স্টেটসম্যান ৯-৭-০৩)

বীরভূম

# ডোনেশান বিরোধী আন্দোলনের জয়

বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমায় বিষ্ণুপুর হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় ২০০ টাকা ডোনেশান নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্ররা প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশান দেয়। কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করলে, ছাত্ররা পর পর দুদিন কাউন্টার অবরোধ করে, তৃতীয় দিনে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করা হয়। ৪ জুলাই ছাত্র ধর্মঘট হয়। কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকলেও, উপস্থিত প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী ও কয়েকশ অভিভাবকের চাপে পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এরপরও কর্তৃপক্ষ অনড় থাকায় ৫ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তখন ছাত্রদের দাবি নিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন এবং শেষপর্যন্ত ছাত্র-অভিভাবকের প্রবল চাপে ডোনেশান নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন।

*৪ জুলাই বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করে*

# ভয়ঙ্কর আক্রমণ করতে পারল কী করে

*তিনের পাতার পর*

সংগঠিত শিল্পে এবং সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের যতটুকু প্রাপ্য এতকাল না দিয়ে পারেনি — এখন সেগুলিও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে আন্দোলন দমনের সরকারী অস্ত্রগুলিকে আরও ক্ষুরধার করা হচ্ছে এবং একাজ বাম-ডান সমস্ত শাসক দলই করছে। জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এসবই তারা করছে দেশবিদেশের বহুজাতিক পুঁজি ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে। বর্তমানে চূড়ান্ত সঙ্কটের সামনে পড়ে মালিকশ্রেণী আরও বেশি বেশি করে চাইছে যখন খুশি, যেমন খুশি শর্তে শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাই করার অধিকার। বাজার অনুযায়ী, মুনাফা অটুট রেখে তারা শ্রমিককে খাটাবে, কিন্তু শ্রমিকের প্রতি কোন গণতান্ত্রিক দায়িত্ব, প্রাপ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, বা এসব দাবি করার কোন অধিকার তারা মানবে না। দুনিয়াজোড়া পুঁজিবাদী সঙ্কটের মুখে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানা দেশে শাসকশ্রেণী কঠোর শাস্তিমূলক আইন করে ধর্মঘট, প্রতিবাদ বাস্তবে প্রায় নিষিদ্ধ করেছে। এই শর্তগুলি এখন ভারতেও শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী চালু করতে চাইছে। যদি জনগণকে তারা বিভ্রান্ত করতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদের বাধাকে অতিক্রম করতে পারে — তবে আগামী দিনে গোটা দেশেই এ জিনিস চালু হবে। জয়ললিতার ধর্মঘটবিরোধী ভূমিকাকেও পুঁজিপতিশ্রেণীর বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক সঙ্কটের পটভূমিতে বিচার করলে, এর পিছনে বুর্জোয়াব্যবস্থার সামগ্রিক আন্দোলনবিরোধী চক্রান্ত এবং ভবিষ্যতে আরও কতবড় আক্রমণের অশনিসঙ্কেত রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারব। বস্তুত, তামিলনাড়ুতে সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জয়ললিতা সরকারের এই হিংস্র আক্রমণ এরই সীমিত এক্সপেরিমেন্ট।

এখানে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর জয়ললিতা সরকারের এই চরম হিংস্র আক্রমণ হঠাৎ করে এসেছে। এর জমি ধীরে ধীরে আগেই তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, দুঃখের বিষয়, এমনকি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বাম দলগুলিও এর দায়িত্ব এড়াতে পারেনা। সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস সঠিকভাবেই বলেছেন, "এই ঘটনা আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।" তিনি আরও বলেছেন, "কোনও রাজ্য সরকারেরই এ-রকম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়" (গণশক্তি ৬-৭-০৩)। ১০ জুলাই গণশক্তিতে 'জয়ললিতার ডাণ্ডানীতি প্রতিরোধ করতেই হবে' শীর্ষক প্রবন্ধে অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী লিখেছেন — "আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি তারা নিজ কর্মচারীদের প্রতি সরকারের এমন আচরণ কল্পনাও করতে পারি না।" কথাটা কি সত্য? একথা ঠিক যে, কংগ্রেসি শাসনে অত্যাচারিত রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও সরকারি কর্মচারীরা বামফ্রন্টকে এভাবেই দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু সি পি এম ফ্রন্ট সরকার কি যথার্থই সেই দায়িত্ব পালন করেছে? অত্যন্ত দুঃখের সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথাগুলো আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

রাজ্যের মানুষ ভুলে যায়নি '৭৮ সালে সাঁওতালডি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন দমন করতে কী নির্মম অত্যাচার বামফ্রন্ট সরকার করেছে। ঝানু আমলা মুস্তাক মুর্শেদকে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে, কর্মচারীর থেকে বেশি পুলিশ পাঠিয়ে, রাতের অন্ধকারে কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে হানা দিয়ে বন্দুকের নল পিঠে ঠেকিয়ে ঘর থেকে তুলে এনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজ করতে তারা বাধ্য করেছে।

সকলেই জানেন, পঞ্চাশের দশক থেকে এ-রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীরা অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। বহু লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই ঐতিহ্য আজ কোথায়? কেন কো-অর্ডিনেশন কমিটি আজ সরকার ও প্রশাসনের ধামাধরা সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তা ভেবে দেখা দরকার। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে বলে কি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি পূরণ হয়ে গিয়েছে? আর্থিক দাবিদাওয়া, নগ্ন দলবাজি ও আমলাতন্ত্রের দাপটের অবসান, কর্মচারীদের বিরোধী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বদলি নীতির দাবি কি আজও নেই? তাহলে সেগুলির বিরুদ্ধে কো-অর্ডিনেশন কমিটির লড়াই নেই কেন? বরং এ রাজ্যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় রাখাটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেজন্য সি পি এম তথা বামফ্রন্টকে ভোটে জেতানোর জন্য ন্যায় হোক, অন্যায় হোক যা যা করা দরকার তা করলেই তাদের কর্তব্য শেষ — এমন ধারণা সৃষ্টি করে শাসক সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার একদিকে সরকারি কর্মচারীদের বৃহত্তর শ্রমিক ও মেহনতী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং তাদের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির শিকারে পরিণত করে বৃহত্তর জনগণের চোখে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে।

সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যারা শাসকদলের ধামাধরা হয়ে থাকতে চায়নি তাদের প্রতিবাদ নির্মমভাবে দমন করতেও সি পি এম নেতারা কুণ্ঠিত হননি। সরকারের বশংবদ সরকারি কর্মচারী সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটি না করায় গত ২৬ বছরে কত হেনস্থা, কত শাস্তিমূলক বদলি কর্মচারীদের হতে হয়েছে তার হিসাব গণশক্তি না দিলেও দিতে পারবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর নেতৃবৃন্দ। ২০০১ সালে শারদোৎসবের মুখে ন্যায্য পাওনা চাইতে গিয়ে "নবপর্যায়" সহ অন্যান্য ৮টি সরকারবিরোধী ইউনিয়নের সদস্যরা খোদ মহাকরণে মন্ত্রীদের চোখের ওপর সি পি এম মাসলম্যানদের হাতে নিগৃহীত হন। এ ইতিহাস কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন? তাঁরা চাষি আন্দোলনে গুলি চালিয়েছেন, অবসরকালীন প্রাপ্য চাওয়ার অপরাধে গৌরীশঙ্কর জুটমিলের বৃদ্ধ শ্রমিককে গুলি করে

*আটের পাতায় দেখুন*

# পানীয় জল পেতেও কর দিতে হবে

*একের পাতার পর*

এই অত্যাবশ্যক পরিষেবাকে বেসরকারি হাতেও তুলে দিতে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে পুর আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করছে তারা। আইনটি সংশোধিত হলে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িক সংস্থা পুরসভাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে অথবা একক উদ্যোগে প্রথমে পুর এলাকায় ও পরে কলকাতা, হাওড়ার মতো কর্পোরেশন এলাকাগুলিতে জল সরবরাহের দায়িত্ব নেবে। এই আইনে সরকার এমন ব্যবস্থা রাখছে যাতে আইনটা চালু হলেই রাজ্য সরকারের আর কোন অনুমতি ছাড়াই পুরসভা এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা সংস্থা যৌথ বা এককভাবে যৌথপ্রকল্প গড়ে তুলে বিনিয়োগের টাকাটা নির্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ যথা সত্বর তুলে নেওয়ার জন্য তাদের পছন্দমত মোটা অঙ্কের 'লাভজনক' হারে জলকর আদায় করতে পারে। জলপ্রকল্প গড়ে তুলে জল সরবরাহ করার জন্য পুরসভাগুলি বিদেশি সংস্থাকেও ডেকে আনতে পারবে। অর্থাৎ বাণিজ্যিকীকরণের পর এবার জল সরবরাহ পরিষেবাকে দেশি-বিদেশি পুঁজির হাতে পুরোপুরি তুলে দিতে চলেছে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার।

পুরমন্ত্রী বলেছেন, এই মুহূর্তে কোন বেসরকারি প্রস্তাব আসেনি, ভবিষ্যতের কথা ভেবে আইন পাল্টানো হচ্ছে। কথাটা নির্ভেজাল অসত্য। ইতিমধ্যেই হলদিয়ায় জল সরবরাহের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সরকার কথাবার্তা চালাচ্ছে। তাছাড়া বোলপুর ও রঘুনাথপুর পুরসভায় জার্মানির এক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে জলপ্রকল্প চলছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার মানুষের পানীয় জলটুকু নিয়ে বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। এখন তাকে আইনি স্যাংশন বা অনুমতি দিতে চাইছে। এই বেসরকারি উদ্যোগে লাভজনক হারের পরিমাণ কত? এ বছর ফেব্রুয়ারীতে রাজ্য সরকার পুরএলাকায় জলের লাইন নেওয়ার জন্য মূল্য বেঁধে দিয়েছে ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। আবার বোলপুর পুরসভায় এই চার্জ সিঙ্গল ট্যাপের জন্য ৫০০০ টাকা, মাল্টিপল ট্যাপের জন্য ৭০০০ টাকা। অর্থাৎ সরকার তাদের মুনাফা লোটার যে সীমাহীন সুবিধা করে দিয়েছে তারই সুযোগ নিয়ে তারা সরকার নির্ধারিত হারের চেয়েও ৪ থেকে ৬ গুণেরও বেশি টাকা আদায় করছে। তাছাড়া ঐ পুরসভায় জলের লাইনের জন্য সুদহীন সিকিউরিটি দিতে হয়। এমনকি রাস্তার কলের জল ব্যবহারের জন্যও সেখানে অত্যন্ত গরিব মানুষের কাছ থেকেও প্রতি মাসে সাড়ে ১১ টাকা করে আদায় করা হয়। প্রস্তাবিত আইনি সংশোধনীটি বিধানসভায় গৃহীত হলে এ চিত্র দেখা যাবে রাজ্যের সর্বত্র।

সুতরাং জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এই প্রাকৃতিক উপাদানটি পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতে এখন মুনাফা লোটার এক চমৎকার উপায়। পুঁজিবাদের এই মুমূর্ষু যুগে, যখন বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভয়ঙ্কর মন্দা, সেইসময়ে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের লোলুপ দৃষ্টি এসে পড়ছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলির ওপর, এমনকি পানীয় জল পর্যন্ত। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সর্বত্র পরিশ্রুত পানীয় জলের যে ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করতে পারেনি, সেই পানীয় জল নিয়েও ব্যবসা করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সি পি এম নেতারা বামপন্থাকে আর কত কলঙ্কিত করবেন? রাজ্যবাসীর প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধকে অস্বীকার করে এই সরকার পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবসা করার ছাড়পত্র দিয়ে হাসি ফোটাতে চাইছে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের মুখে — যাদের দাক্ষিণ্যে ২৬ বছর ধরে তারা ক্ষমতায় আসীন। সেই দাক্ষিণ্য নির্বিবাদে পাওয়ার বিনিময়ে যদি ক্ষুধার্ত, শিক্ষাহীন, অসুস্থ দরিদ্র মানুষ তৃষ্ণার জলটুকুও না পেয়ে ছটফট করে মরে তো মরুক, তাতে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের কিছু যায় আসে না।

বস্তুতপক্ষে, বর্তমানে সরকারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে — একদিকে সাধারণ মানুষের দায়দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুনাফা লোটার জন্য একের পর এক পরিষেবা ক্ষেত্র বেসরকারি হাতে ব্যবসার জন্য তুলে দেওয়া, অন্যদিকে ক্রমাগত বঞ্চনার শিকার সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া ক্ষোভ-বিক্ষোভকে পুলিশি দমন পীড়নের সাহায্যে নির্মূল করার চেষ্টা করা। এই অবস্থায় সঠিক রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া সাধারণ মানুষের বাঁচার অন্য কোনও পথ আজ আর নেই।

# ব্যাঙ্কগুলিতে ফের স্বেচ্ছাবসর

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে আর একদফা স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প (VRS) চালু করা হবে বলে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কস্ অ্যাসোসিয়েশন (IBA)-এর চেয়ারম্যান দলবীর সিংহ জানিয়েছেন। এখানে স্মরণ করা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে দু'তিন বছর আগে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বিভিন্ন স্তরের লক্ষাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে বিদায় নিয়েছেন। ব্যাঙ্ক শিল্পে নতুন নিয়োগ দীর্ঘকাল বন্ধ। এছাড়া একটা ভাল সংখ্যক কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা ১০ লক্ষেরও নিচে নেমে এসেছে। এরপর আসন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রাক্কালে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কস্ অ্যাসোসিয়েশন যে ১৮ দফা শর্ত ইউনিয়নগুলিকে দিয়ে মানিয়ে নিতে চাইছে তার প্রথম শর্ত হ'ল চাকরির মেয়াদ কমানো। এতে বলা হয়েছে ৩০ বছর চাকরি কিংবা ৫৫ বছর বয়স-এর কোন একটি পূরণ হয়ে গেলে যে কোন কর্মচারীর চাকরি জীবনের ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। এরপর স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প ফের চালু হলে এক ধাক্কায় প্রচুর কর্মচারী কমে যাবে। স্বেচ্ছাবসর প্রকল্পে 'স্বেচ্ছা' কথাটি থাকলেও কর্মচারীদের এই প্রকল্পের মধ্যে যেতে সরকার একরকম বাধ্য করছে। এখানে পরোক্ষ হুমকির বিষয়টিকেও অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া চাকরি থাকবে কি থাকবে না এই অনিশ্চয়তাও কর্মচারীদের স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সারা দেশে যখন বেশিরভাগ শিল্পেই মন্দার কারণে এবং আধুনিকীকরণের ফলে কর্মচারী উদ্বৃত্ত হচ্ছে এবং দেশজুড়ে বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছে তখন ব্যাঙ্ক শিল্পে এই পদক্ষেপ রীতিমত উদ্বেগজনক। কর্মী কমে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলিতে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনাও বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, যে সমস্ত ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে সেখানে কোন সশস্ত্র রক্ষী নেই। যেখানে যেখানে রক্ষী ছিল, অবসরের পর সেই সমস্ত পদে কোন নিয়োগ হয়নি। ব্যাঙ্কে কর্মীসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে অনাদায়ী ঋণ আদায় উপেক্ষিত হচ্ছে, ব্যবসার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে, পরিষেবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিঘ্ন ঘটছে। এমনকি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদেরও কোথাও কোথাও কাউন্টারে বসে টাকা দেওয়া-নেওয়া করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কম্পিউটার আসার পরে কর্মচারীদের কাজের সময়সীমা কমার পরিবর্তে সব কর্মচারীরই কাজের সময়সীমা বাস্তবিকই বেড়ে গিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে এবং পরেও কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ ব্যাঙ্ক শিল্পের এই পরিণতির জন্য কোনওভাবেই ব্যাঙ্ক শিল্পের রুগ্নতা দায়ী নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, গত মার্চ মাসে যে আর্থিক বছর শেষ হয়েছে তার হিসেবে ভাল পরিমাণ লাভ করেছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া তার আগের আর্থিক বছরের মুনাফা প্রায় ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে এবারে ৩১০৫ কোটি টাকার মত নিট লাভ করেছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাদের মুনাফা প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে এবার নিট মুনাফা করেছে ৮৪২ কোটি টাকারও বেশি। এ চিত্র কমবেশি সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের। এমনকি দুর্বল ব্যাঙ্ক বলে যাদের একসময় আখ্যায়িত করা হয়েছিল তারাও এবার ভাল পরিমাণ নিট মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস তথা বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ খুবই গুরুত্বহীন করে দেখছে। কত কম বেতন দিয়ে, কর্মচারীদের বঞ্চিত করে, মাথাপিছু কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়ানো যায় — এই তাদের লক্ষ্য। এনিয়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যাতে আন্দোলনমুখী হতে না পারে তারজন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ারও নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শুধু কর্মচারীদের নয়, গ্রাহকদেরও তারা নানাভাবে বঞ্চিত করছে। জমা আমানতের ওপর সুদের হার কমিয়ে দেওয়া, আর্থিক দিক থেকে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা সঙ্কুচিত করা, বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে সারভিস চার্জ বাড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের পরিষেবার ক্ষেত্রটিকে বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হয়েছে।

কর্মচারীদের স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য করে, নতুন নিয়োগ না করে, অতিরিক্ত কাজ করিয়ে এবং গ্রাহকদের বঞ্চিত করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বিপুল পরিমাণ মুনাফা দেখানোর চেষ্টা কেন করছে? এর প্রধান কারণ হ'ল বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক এখন বাজারে যে শেয়ার ছেড়েছে সেই শেয়ারগুলিকে অধিক লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় করে তোলা। যারা এখনও বাজারে শেয়ার নিয়ে আসেনি, এর দ্বারা তাদেরও নিয়ে আসাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই শেয়ারগুলিকে বেশি বেশি করে বাজারে ছাড়ার মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই আজ এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বলা বাহুল্য আর্থিক উন্নয়নের নানা গালভরা কথা বলেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আর্থিক উদারনীতির হাত ধরেই এগুলো ঘটছে।

এই পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর তথা কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকাও বড় কম নয়। এটা দুঃখের হলেও সত্য যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের এবং সাধারণ গ্রাহকদের বিরুদ্ধে যে মারণাস্ত্র বিভিন্ন সময়ে তৈরি করেছে, তাকে শাণিত করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও বহু সময় সহকারী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। তাই ব্যাঙ্কে কম্পিউটারাইজেশনের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ক্ষোভের মুখে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন AIBEA নেতৃত্বের ঘোষণা ছিল — The patriotic sense of responsibility demands of us the introduction of computer in the banking industry. আরও এই কথা বলে কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল যে — Settlement in computerisa-tion will not squeeze the employment opportunity in the banking industry. আর আজ যখন ব্যাঙ্ক শিল্পে কর্মচারীর সংখ্যা কমছে, মোটা মুনাফা অর্জন সত্ত্বেও কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, গ্রাহকদের গরিষ্ঠ সংখ্যক অংশকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারীকরণ করার ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তখন ব্যাঙ্ক শিল্পে সব ধরনের কর্মচারীদের ৯টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউ এফ বি ইউ (UFBU) গঠন করার পরও আলাদা আলাদা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিগত দিনে যেটুকু আন্দোলন হ'ত আজ তাও দেখা যাচ্ছে না।

এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও আই ডি বি আই'র সংগ্রামী কর্মচারীরা দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার লড়াই-এর মাধ্যমে নতুন নিয়োগ করাতে সক্ষম হয়েছেন, চুক্তিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। তাদের এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এগিয়ে এসেছিলেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম-এর নেতৃত্বে। বর্তমানে আই বি এ'র ১৮ দফা ভয়ঙ্কর শর্তের বিরুদ্ধে, সম্মানজনক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অতি সত্বর করার দাবিতে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পে-স্কেল, প্রমোশন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং সবার জন্য পেনশন-এর দাবিতে অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম দেশব্যাপী প্রচার, স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মুম্বাই-এ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এ্যাসোসিয়েশন-এর সদর দপ্তরের সামনে ধর্ণা ও আই বি এ'র চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

## কমরেড নমিতা (দীপ্তি) বিশ্বাস লাল সেলাম

এস ইউ সি আই গুয়াহাটি জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড নমিতা বিশ্বাস দীর্ঘদিন কঠিন রোগভোগের পর গত ৪ঠা জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বৎসর।

কমরেড বিশ্বাস ১৯৭০ সালে এযুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতবর্ষের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের একমাত্র হাতিয়ার যে এস ইউ সি আই দল — এই দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হন। এবং সেদিন থেকেই নিজেকে দলের সাথে যুক্ত করে পরম নিষ্ঠায় দল গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আসামে দল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এক কঠিন সময়ে কমরেড বিশ্বাস দলের সকল নির্দেশ, সব ধরনের কাজ হাসিমুখে পালন করেন। বিপ্লবী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের নেতৃত্বের নির্দেশে যে কোন কাজ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। নিষ্ঠা এবং সহজ সরল অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা তিনি দলের নেতা, কর্মী ও জনসাধারণের অতি আপনজন হয়ে ওঠেন। ছাত্র-যুবক বিশেষ করে মহিলাদের অনেককেই তিনি দলের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের সভ্য, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের রাজ্য কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

## মেদিনীপুর জেলা জুড়ে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন

# ৭ জুলাই সফল ছাত্র ধর্মঘট

রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের বিধ্বংসী শিক্ষানীতির ফলে স্কুলে কলেজে বিপুল হারে বর্ধিত ফি চালু, শত শত টাকা ডোনেশন আদায় শুরু হয়েছে। গরিব ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারছে না। একমাত্র ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডি এস ও এই ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন আদায় ও শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে ডি এস ও'র আন্দোলনের চাপে মেদিনীপুর শহরের নারায়ণ বিদ্যাভবন ৫০০ টাকা ডোনেশন নেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের নৈপুর উচ্চ বিদ্যালয় কম্পিউটার শিক্ষা 'বাধ্যতামূলক' করে ১৭০০ টাকা ভর্তি ফি আদায় শুরু করে। ডি এস ও'র আন্দোলনের চাপে 'বাধ্যতামূলক' সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ৩ জুলাই মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন রাঙামাটি স্কুলে বর্ধিত ফি ও ৫০০ টাকা ডোনেশন আদায়ের প্রতিবাদে ছাত্র-অভিভাবক ও ডি এস ও কর্মীদের বিক্ষোভ আন্দোলনের ওপর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকের নেতৃত্বে স্থানীয় সি পি এম বাহিনী আক্রমণ করে। তারা ঐ সময় ঘটনাস্থলে সংবাদ সংগ্রহে উপস্থিত আলফা টি ভি'র সাংবাদিককেও আক্রমণ করে ও তাঁর ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে তাঁকে ঘরের মধ্যে আটক রাখে। ডি আই-এর সার্কুলার অস্বীকার করে বেশি হারে ফি আদায় ও বেআইনি ডোনেশন নেওয়ার প্রতিকারের দাবিতে মেদিনীপুর ডি আই অফিসে ঐদিন ডেপুটেশনে যায় ডি এস ও কর্মীরা। ডি আই-এর সামনে ঐ অফিসের কো-অর্ডিনেশন কমিটির কিছু কর্মী ডি এস ও কর্মী-নেতাদের আক্রমণ করে, ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। ৪ জুলাই ভোরে আক্রান্ত ৪ জন ছাত্রকে সংগঠনের অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ-প্রশাসন ও সরকারি দলের এই বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে ৪ জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করে ডি এস ও, এবং ৭ জুলাই দুই জেলায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য সি পি এম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী বহু স্কুলের গেটে জড়ো হয়ে পিকেটিংরত ডি এস ও কর্মীদের মারধোর করে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। দুই জেলায় ছাত্রসমাজ ধর্মঘটের ডাকে ব্যাপক সাড়া দেয়। ঝাড়গ্রাম ও নারায়ণগড় ডি এস ও'র জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড মৌসুমী বেরা ও কার্তিক প্রধান সি পি এমের গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে আহত হয়। দুই জেলায় ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত দাস জেলার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ও ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪৮ সংখ্যা ৮

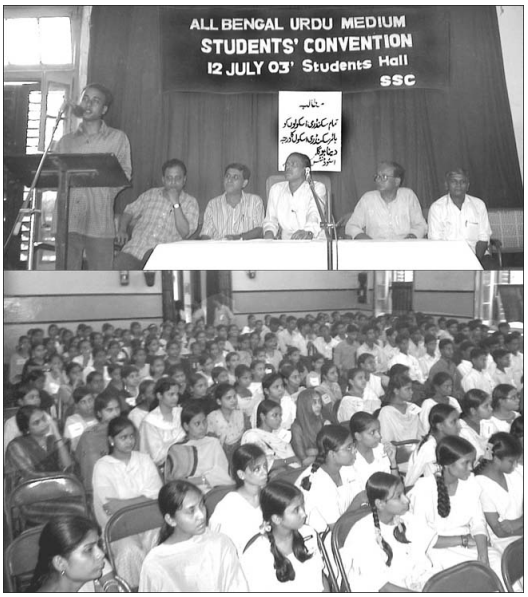


*মাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্র, উর্দু মাধ্যম স্কুল-কলেজ বাড়ানো এবং বেশি সংখ্যায় উর্দু শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে স্টুডেন্টস্ স্ট্রাগল কমিটির উদ্যোগে ১২ জুলাই কলকাতায় স্টুডেন্টস্ হলে রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কবি ডঃ সাব্বির আবরাবী। তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই কনভেনশনে যোগ দেয়।*

## বীরভূমে ছাত্র আন্দোলনের জয়

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সমস্যা সমাধানের দাবিতে এবং স্কুলগুলিতে বিপুল ফি বৃদ্ধি ও ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন আদায়ের প্রতিবাদে বীরভূম জেলার বোলপুরে সারা ভারত ডি এস ও'র নেতৃত্বে ২৪ জুন থেকে লাগাতার ছাত্র আন্দোলনের চাপে বোলপুরের নীচুপাটি বিদ্যালয়, বয়েজ ও গার্লস উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনরকম ডোনেশন ছাড়াই সরকার নির্ধারিত ফি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ স্কুলগুলিতে বিভিন্ন বিভাগে ১০ থেকে ৩০টি আসন বাড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দেন। ৫ জুলাই বাঁধগোড়া উচ্চবিদ্যালয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর আন্দোলন ভাঙতে সি পি এম গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ করে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরোধে সি পি এম বাহিনী পিছু হটে যায়। এর প্রতিবাদে এদিন বোলপুর শহরে শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল ও পথসভা করে ধিক্কার জানায় এবং ছাত্র আন্দোলন আরো দুর্বার করার আহ্বান জানায়।

## পেট্রল-ডিজেলের ট্যাক্সবৃদ্ধি, শিক্ষায় ফিবৃদ্ধি ও সরকারি হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদ

*এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —*

"পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি জনগণের উপর রাজ্য সরকারের মারাত্মক আঘাত হিসাবে এসেছে। এর ফলে সমস্ত জিনিসপত্রের দামও বাড়বে। এছাড়া রাজ্য সরকার শিক্ষার সর্বস্তরে অত্যধিক ফি-ডোনেশন বাড়িয়ে, মেডিক্যালে ক্যাপিটেশন ফি চালু করে, ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে শিক্ষাক্ষেত্রেও ভয়াবহ আক্রমণ চালাচ্ছে। গ্রামীণ প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুই-তৃতীয়াংশ ইন্‌ডোর বন্ধ করে দিয়ে এবং হাসপাতালগুলিতে অত্যধিক চার্জ ও ফি চালু করে গরিব মানুষের চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। আমরা এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং সাথে সাথে এগুলি প্রত্যাহারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।"

## দার্জিলিং-এর ধ্বসে মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রশাসনিক ব্যর্থতাই দায়ী

*দার্জিলি) জেলায় ধ্বসে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —*

"বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও দার্জিলিং জেলায় ধবস নামা, ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য ছিল না। প্রথমত, জঙ্গলের গাছকাটার ফলে মাটির ক্ষয়রোধ করার ক্ষমতা কমছে, পাথর গড়িয়ে পড়ছে, নদী ও ঝরণার জল গতিপথ পাল্টাচ্ছে এবং ধবস সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়ত, ধবসপ্রবণ এলাকায় হিল কাউন্সিল ও রাজ্য সরকার আশ্রিত দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদাররা গার্ড ওয়ালগুলি রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করায় অতি সহজেই ধবস নামছে। তৃতীয়ত, প্রশাসন আশ্রিত প্রোমোটাররা পাহাড়ের উপর ও তলায় বাড়ি নির্মাণ করায় ঝরণার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে ধবসের প্রবণতা বাড়াচ্ছে। এছাড়া বৃটিশ আমলের তৈরি প্রাচীন ব্রিজগুলি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত না করায় এবং প্রয়োজনীয় নতুন ব্রিজ না করায় এগুলিও ভেঙ্গে পড়ছে। ফলে এই ধবস নামা ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রশাসনিক ব্যর্থতাই দায়ী। অন্যদিকে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে নিষ্ঠুর অবহেলা করার জন্যই এ পর্যন্ত ৫০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে যার অধিকাংশই গরিব মানুষ। আমরা রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছি এবং দাবি করছি — (১) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য, রিলিফ বণ্টন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। (২) মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। (৩) ভবিষ্যতে এই ভয়াবহ বিপর্যয়রোধে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

# ভয়ঙ্কর আক্রমণ করতে পারল কী করে ?

*ছয়ের পাতার পর*

মেরেছেন, মরিচঝাঁপির অসহায় উদ্বাস্তুদের দ্বীপের মধ্যে পুলিশ লঞ্চ দিয়ে ঘিরে ভাত-জল-ওষুধ বন্ধ করে, গুলি চালিয়ে, রাতের অন্ধকারে ক্যাডার দিয়ে উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী চালাঘরে আগুন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছেন। সাম্প্রতিককালে বাসভাড়া বৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, ছাত্রদের ফি বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ওপর পুলিশ ও দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে হামলা, আন্দোলনকারী মহিলাদের ওপর অশালীন আচরণ — তাদের আন্দোলনবিরোধী চরিত্রকেই প্রকট করেছে।

চুক্তিতে নিয়োগ, 'কর্মসংস্কৃতির' নামে মালিকশ্রেণীর ক্রীতদাসত্ব মেনে নেওয়া, 'বিশেষ শিল্পাঞ্চল', 'এক্সপোর্ট প্রমোশন জোন' করে সেখানে আন্দোলন-প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করা, মিটিং-মিছিলের দিনক্ষণ এলাকা বেঁধে দেওয়ার কথা সি পি এম নেতারা বারবার বলছেন। কেন তাঁরা বলছেন এসব কথা? যদি সত্যিই নীতিগতভাবে তাঁরা শ্রমিক আন্দোলন, গণআন্দোলনের পক্ষে হতেন তবে এ-কথা তাঁরা তুলতেনই না। কথাগুলো তাঁর তুলছেন দুটি লক্ষ্য থেকে। প্রথমত তাঁরা মালিকশ্রেণীকে দেখাতে চান যে, তাঁরা আসলে শ্রমিক আন্দোলন বন্ধই করতে চান। দ্বিতীয়ত, নিজ দল, অন্যান্য দল ও ব্যাপক বামপন্থী জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অতীব ধূর্তের মতো কথাগুলো বারবার তুলে, 'উন্নয়ন' এবং 'জনগণের অসুবিধা দূর করার" কথা বার বার বলে একে অনিবার্য বলে তাঁরা দাঁড় করাতে চাইছেন।

একথা কি অস্বীকার করা চলে যে, বিশ্বায়ন-উদারীকরণ চালু হওয়ার পর গোটা দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর যে ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে গোটা দেশব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে শক্তিশালী কোন আন্দোলন তাঁরা গড়ে তোলেননি। ৫৬টি গণসংগঠনের একটি সর্বভারতীয় মোর্চাকে, বারবার বলা সত্ত্বেও বছরে ১টি বা ২টি শিল্প ধর্মঘটের কর্মসূচি ছাড়া তাকে একটি শক্তিশালী জঙ্গি আন্দোলনের মঞ্চে পরিণত করার কোন চেষ্টা করেননি। এমনকি, তামিলনাড়ুতে সরকারী কর্মচারীদের ওপর এতবড় একটা স্বৈরাচারি দমনমূলক কাজের পরেও কিছু বিবৃতি এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার বাইরে তাঁরা যাননি। বরং পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় থেকে জঙ্গি আন্দোলন চলবেনা, ঘেরাও অবরোধ চলবেনা, ধর্মঘট চলবে না, শিল্পে অশান্তি চলবে না — এইসব বলে বলে শ্রমিক আন্দোলনের কোমর তাঁরা ভেঙ্গে দিয়েছেন।

চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলি সহ তাদের এই সমস্ত আচরণ গণআন্দোলনবিরোধী যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে — তা-ই জয়ললিতা বা তার মতো শাসকদের এহেন ভয়াবহ স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলি এ জিনিস করবেই। কিন্তু তারা চেষ্টা করলেও শ্রমিক আন্দোলনের-গণআন্দোলনের এতবড় ক্ষতি করতে পারতনা, যত বড় ক্ষতি মার্কসবাদ-বামপন্থার নাম নিয়ে তাঁরা করে চলেছেন। সে কারণে দুঃখের হলেও তাদের সম্পর্কেই আমাদের বারবার বলতে হচ্ছে। আশাকরি, সিপিএম-এর সমস্ত কর্মী-সমর্থক আমাদের কথা ভেবে দেখবেন।

জয়ললিতা সরকারের এই বেপরোয়া আক্রমণ আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর যে আক্রমণের ইঙ্গিত দিচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা মনে করি অতীতে যাই হয়ে থাক এখনই সি পি এম সহ শাসক বামপন্থী দলগুলিকে — ভোটের স্বার্থে আন্দোলন, আর ক্ষমতায় থাকলে আন্দোলন তো নয়ই বরং আন্দোলন দমন — এই দু-মুখো সুবিধাবাদী নীতি ত্যাগ করে দেশব্যাপী সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোন সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে না পারে।

## কমসোমলের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

গত ২৮-২৯ জুন মুর্শিদাবাদ জেলা কমসোমলের উদ্যোগে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির স্কুলে। ৭০ জন কিশোর-কিশোরী এই শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন মনীষী এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রামের নানাদিক তুলে ধরে তিনি দেখান, বিপ্লবীরা কিশোর বয়স থেকেই সমাজের সমস্যা নিয়ে ভেবেছে এবং তার প্রতিকারে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে, সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাদের সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি দেখান আজকের পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা কেমন করে সুকৌশলে শিশু কিশোরদের মনকে বিষাক্ত করে তুলছে। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন থেকে মুক্তির জন্য, সমাজবিপ্লবের জন্য নিজেদের কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার আবেদন জানান। দু'দিনের এই আলোচনা সকলের মনেই রেখাপাত করে।

**শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীকরণ, বেসরকারীকরণ, বৃত্তিমুখীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ রুখতে**

**২৯ জুলাই**

**সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট**

**সফল করুন**

**এ আই ডি এস ও**

*সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।*

*ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ* suci_cc@vsnl.net